দৈনিক
দিনকাল
THE DAILY DINKAL

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্ম-অকর্ম প্রসঙ্গ

ইবরাহিম রহমান

এই সরকার একটি সাংবিধানিক সরকার, যদিও তার মেয়াদ ছিল শুধু ৯০ দিন মাত্র। ৯০ দিন পার করে তারা দুই বছর থাকার ফন্দি করেছে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করে। রেডিও-টেলিভিশনে ভাষণের মাধ্যমে আগামী ডিসেম্বরে নির্বাচনের কথা যত হলফ করেই বলা হোক না কেন, মানুষ তাদের কথায় আস্থা আনতে পারছে না। ইদানীং আমাদের পশ্চিমা বন্ধুরা হঠাৎ সোচ্চার হওয়াতে মানুষের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়েছে। কারণ পশ্চিমা বন্ধুদের বন্ধুত্ব ইতিমধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। পশ্চিমা বন্ধুরা ১১ জানুয়ারির পূর্বে দলে দলে সংঘাতকে উস্কে দিয়ে তারা বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করেছে বলে সাধারণ মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস। প্রফেসর ইয়াজউদ্দীনের নেতৃত্বে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছিল তার মেয়াদ ছিল মাত্র ৯০ দিন। সেই সরকারের সময় আমাদের কতিপয় বন্ধু রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের ব্যস্ততা মানুষের মনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। পরিকল্পিতভাবেই সেই সরকারকে ব্যর্থ করা হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। যা হোক ইয়াজউদ্দীন সরকারের পর যে সরকার শপথ নিল তারাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামেই শপথ নিয়েছে। অর্থাৎ ফখরুদ্দীনের নেতৃত্বে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় তা ছিল ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরই ধারাবাহিকতা। তাদের মেয়াদও ৯০ দিন। এদেরও দায়িত্ব শুধু নির্বাচন অনুষ্ঠান। তার সঙ্গে দৈনন্দিন রুটিন ওয়ার্ক। সাংবিধানিক গণ্ডির কথা ভুলে গিয়ে তারা এখন জাতীয় দায়িত্ব পালন করছে। এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হেনকাজ নেই যেখানে তারা হাত দেয়নি। আর যে কাজেই হাত দিয়েছে সে কাজটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। এদিকে জাতির বেজেছে বারোটা। মানুষের বেড়েছে দুর্ভোগ আর যন্ত্রণা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে, শিশুদের হাতে লোহা বা লোহাজাত কোনো যন্ত্র দিতে নেই। কারণ লোহাটা হাতে নিয়েই শিশুটি কারো মাথায় বাড়ি দিয়ে বসবে, না হয় কোনো চারাগাছটা নষ্ট করে ফেলবে বিশ্বাস তো নেই।

আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবস্থা হয়েছে শিশুদের মতো। না বুঝে সব জায়গায় হাত দিতে গিয়ে জট পাকিয়ে ফেলেছে যা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কাকে ধরবে কাকে মারবে কাকে ফাঁসি কাকে কত বছর জেল দেয়া যায় এই নিয়েই তারা ব্যস্ত। মানবাধিকার মান-মর্যাদা এ সবতো একেবারে নির্বাসনে। '৭৪ সাল ব্যতিরেকে আমাদের দেশে খাদ্য সংকট কোনো সময়ই ছিল না। সরকারের যে রিজার্ভ স্টক থাকে তাতে কোনো সময় যদি ঘাটতি বা কম পড়ে যায় সরকার গোপনেই তা পূরণ করে রাখে। সরকার কোনো সময়ই তা জনসমক্ষে আসতে দেয় না। কারণ খাদ্যাভাব জনসমক্ষে আসলেই অসৎ ব্যবসায়ীরা তার সুযোগ নেয়। '৯১ সালে বিএনপি সরকার যখন ক্ষমতায়, সরকারি গুদামে নাকি তখন ৩ লাখ টন চালের ঘাটতি ছিল। হঠাৎ করেই প্রধানমন্ত্রী মান্নান ভূঁইয়াকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ধারণা ছিল মান্নান ভূঁইয়া বামপন্থী লোক। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চাল আমদানি করে স্টক পূরণ করতে পারবেন। জানা যায়, ঠিক ওই সময় জ্বালানিমন্ত্রী ড. মোশাররফ ছিলেন দিল্লীতে। তিনি খবর পেয়ে স্বউদ্যোগে দিল্লী থেকে সরাসরি কলকাতায় এসে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে আলোচনা পাকাপাকি করে প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন যে, ৩ লাখ টন চাল আমদানির ব্যবস্থা হয়েছে। ড. মোশাররফ একঢিলে চার পাখি মারলেন। প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করলেন, মান্নান ভূঁইয়াকে টেক্কা দিলেন, মিডিয়াকে সংকট বুঝতে দিলেন না, আর নিজের কৃতিত্ব তো আছেই। আওয়ামী লীগের সময়ও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। তারাও গোপনেই ঘাটতি পূরণ করে নিয়েছে। বর্তমান সরকার কাজ করেছে আনাড়ি শিশুদের মত। এই বছর দুই দুইবার বন্যা, একটা ভয়াবহ সিডর হয়ে গেল। ফসলহানি ব্যাপক। তদুপরি ওনাদের মুরব্বী বিশ্বব্যাংকের কথায় মাত্র আড়াই লাখ টন চাল রিজার্ভ স্টকে রেখেছেন, যেখানে থাকার কথা দশ লাখ টন। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। ওনারা বন্যা বা সিডরের সাথে সাথে চাল কিনে ফেলতে পারতেন। তা না করে ভারতের ঝুলানো মুলার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। যে ভারত আমাদের রমজানের সময় পিঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেয় তাদের পিছনে ছুটলেন চালের আশায়। আর তারা পরিকল্পিতভাবে আমাদের দেশে চাল-গমের দাম বাড়িয়ে দিয়ে দেশে আকাল সৃষ্টি করলো। খাদ্যসামগ্রী কিনতেই এখন মানুষের নাভিশ্বাস। আয়ের বারো আনা চলে যায় খাদ্য কিনতে।

জরুরি ও মার্শাল ল' দু'টোই জংলি আইন। এই আইন সভ্য সমাজের জন্য নয়। যে কারণে জরুরি বিধি বা সামরিক বিধি উঠে গেলে

প্রচলিত আইনের কাছে জরুরি বা সামরিক বিধির বিচার ধোপে টিকে না। অথচ এই জরুরি বিধি (১২০ দিন পর যা অকার্যকর) দ্বারা ওনারা সরকারের স্থায়িত্ব বাড়াতে চান, এখানেই সন্দেহের বীজ। এই আইনের প্রয়োগ দ্বারাই দেশে এখন চার কোটি লোক বেকার। বেশিরভাগ মানুষই একবেলা, কেউ আধাবেলা খায়। আয় নেই, রোজগার নেই, দুঃখের কথা কাউকে বলতেও পারছে না। গ্রামগঞ্জে জরুরি আইন প্রয়োগের মাধ্যমে লাখ লাখ দোকান ভাঙচুর করে লাখ লাখ লোককে ভিটেমাটি ছাড়া করা হয়েছে। শহরে হকার উচ্ছেদের নামে লাখ লাখ লোককে করা হয়েছে বেকার। বেকায়দায় পড়ে কিছু লোককে সুযোগ দিলেও বহু হকার এখনো পুলিশী হয়রানির শিকার। এ সরকারের প্রতি আস্থাহীনতার কারণে জনশক্তি ব্যবসা লাটে ওঠার উপক্রম। বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা হাত গুটিয়ে বসে আছেন। যৌথবাহিনীর হয়রানির ভয়ে কেউ ব্যবসায় হাত দিচ্ছে না। টাকা থাকলেও বের করছে না। ফলে ব্যবসায় চলছে চরম অচলাবস্থা। অর্থনীতিতে এসেছে স্থবিরতা। সব কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন ওনারা। জনমতের তোয়াক্কা না করে হঠাৎ নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণের ঘোষণায় মানুষ তো হতবাক! ডিসেম্বরে নির্বাচনের ওয়াদা তাহলে শুধুই ফাঁকা বুলি?

এ সরকারের আরেক নাম ‘সংঘাতের সরকার’। যে কাজটি ’৭৪ সালেই শেষ হয়েছে, সেই বিতর্কিত বিষয়গুলো আবার সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধের বিষয়কে সামনে নিয়ে এসে নতুন করে সংঘাত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। সেদিন হাফেজী হুজুরের স্মরণ সভায় বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী যুদ্ধাপরাধের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ কোনো অপরাধ নয়। যুদ্ধের ভিতর যুদ্ধের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে যারা বাড়াবাড়ি করেছে, যারা নিরীহ লোকদের অন্যায়ভাবে আক্রোশের বশে হত্যা করেছে শুধু তারাই যুদ্ধাপরাধী। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব ভাষণ দেবেন। অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। স্বাধীনতার দাবিতে সারাদেশ টালমাটাল। ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য সারাদেশে দাবি উঠেছে। মওলানা ভাসানী আতাউর রহমান খানকে গোপনে পাঠালেন শেখ মুজিবের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব দিয়ে। আতাউর রহমান খান আমাদের কাছে ঘরোয়াভাবে বিষয়টি যেভাবে পরিবেশন করেছেন তা হলো, “নেতা আপনিও কি মওলানা ভাসানীর মত পাগল হয়েছেন নাকি! স্বাধীনতা ঘোষণা করে আমরা কোথায় যাব, চারদিকে ভারত! যে ভারতের বিরুদ্ধে সারাজীবন সংগ্রাম করলাম সেই ভারতে আমরা আশ্রয় নেবো? নাকি আমার-আপনার পক্ষে আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়া সম্ভব! চুপ থাকেন, দেখেন কি হয়। একটা ফয়সালা হয়ে যাবে।” ঠিক এই সময় আমরা দশ-বারো জন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে বসন্তরোগের চিকিৎসাধীন। রোগাক্রান্ত হয়ে আমরা রাজপথে নামতে পারছি না। আমরা বসন্ত রোগীরা রোগশয্যা থেকেই ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করলাম। ৬ মার্চ জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে তা ছাপা হয়। হাসপাতাল থেকে বের হয়ে আমি নিজের বাসায় বিশ্রামে ছিলাম। এই সময়ই ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউন। বহু কষ্টে কিছু পথ লঞ্চে কিছু পথ পায়ে হেঁটে ৩০ মার্চ সপরিবারে গ্রামের বাড়ি আশ্রয় নিলাম। তখনও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ নই। যুদ্ধ শুরু হলে চেষ্টা করলাম ভারতে যাওয়ার। আমাদের নেতা ফেরদৌস কোরেশী, আল মুজাহিদী (তখন বাংলা ছাত্রলীগের সভাপতি), মোশারফ হোসেন (বাংলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক), আলতাফ হোসেন (সহ-সভাপতি), শেখ হারুন (সাংগঠনিক সম্পাদক), রিয়াজুল হক (সহ-সম্পাদক)সহ সকলে চলে গেছেন ভারতে। আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক খাজা নিজাম উদ্দিন সিলেটের কানাইঘাটে সম্মুখ যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন। ইবরাহিম রহমান, খাজা নিজামউদ্দিন ছিলাম মানিকজোড়। কলকাতায় আমাদের নেতারা ধরে নিয়েছিল ইবরাহিম রহমানও যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছে। ইবরাহিম আর খাজার জন্য কলকাতায় শোকসভাও হয়েছে। এদিকে আমি আটকা পড়ে আছি গ্রামের বাড়ি। সুযোগ খুঁজছি কিভাবে কলকাতা বা আগরতলা যাওয়া যায়। আমাদের এলাকার প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা ফয়েজ বক্স পাটোয়ারীর কাছে পরামর্শ চাইলাম কিভাবে কলকাতা বা আগরতলা যাওয়া যায়। আমি তখন বাংলা ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির দফতর সম্পাদক। তিনি বুঝলেন আমি আওয়ামী লীগ বিরোধী লোক। তিনি বললেন, দেখ, আমি তোমাকে কলকাতা বা আগরতলা পাঠিয়ে দিতে পারি। পথে তোমাকে ছাত্রলীগের ছেলেরা যদি মেরে ফেলে সে দায়িত্ব কে নেবে? এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটে চলছে। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, দেশে যুদ্ধ সংগঠনের জন্য শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন। তুমি আমার কাছে থেকে যুদ্ধ সংগঠনের কাজ কর। তিনি আমাকে স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্ব দিলেন। সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক হিসেবে আমি যুদ্ধ সংগঠনে অংশগ্রহণ করলাম দীর্ঘ ৯ মাস। এই ৯ মাসে নিজের বাড়িতে কোনো দিন ঘুমাতে পারিনি। দূর দূরান্তে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বনে-বাদাড়ে কাটাতে হয়েছে বহুদিন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বহুলোক যারা আওয়ামী লীগ করতেন না, যুদ্ধেও কোনো প্রকার অংশগ্রহণ করেননি কিংবা একদম নিষ্ক্রিয় ছিলেন বা একদম নিরপেক্ষ ছিলেন এমনকি মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নৈতিক সমর্থন ছিল এমন হাজার হাজার আলেম, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের শুধুমাত্র ভিন্নমত তথা আওয়ামী লীগ না করার কারণে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডগুলো কি যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞায় পড়ে না? বিজ্ঞ সেক্টর কমান্ডারগণ এই বিষয়গুলো তদন্ত করবেন কি? স্বঘোষিত যুদ্ধাপরাধের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি কি এসব হত্যাকারীর ব্যাপারে তদন্ত করবে? নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে এই সব হত্যাকারী যুদ্ধাপরাধের আওতায় পড়তে বাধ্য।

পশ্চিমা মোড়লরা অন্যান্য মুসলিম দেশের মত বাংলাদেশেও সংঘাত সৃষ্টি করতে চায়। ২৮ অক্টোবর থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত সংঘাতও তাদের পরিকল্পনারই অংশ। সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাংকের কিছু প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে বাংলাদেশে বসিয়ে দেয়া হয়েছে মাত্র। আইয়ুব খানের শাসনামলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যখন টেলিফোন করতেন গভর্নর মোনেম খান টেলিফোন ধরার সময় নাকি দাঁড়িয়ে যেতেন। যখন তাকে বলা হলো টেলিফোন ধরার সময় দাঁড়িয়ে গিয়ে যে শ্রদ্ধা আপনি দেখাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট তো তা দেখছেন না। জবাবে গবর্নর বাহাদুর নাকি বলতেন আমার কাজ আমি করি প্রেসিডেন্ট দেখলো কিনা তা আমার জানার বিষয় নয়। বর্তমান সরকারের কতিপয় উপদেষ্টার ক্ষেত্রে অবস্থা কতকটা সেরকম। বিশ্বব্যাংকের কোন কর্মকর্তা ফোন করলে তারা দাঁড়িয়ে যান। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়েছে। মানুষ দারুণ খুশি হয়েছিল। এবার তাহলে দুর্নীতি আসলেই দমন হবে। কিন্তু না এখানেই রাজনীতির ভেল্কিবাজি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাছাই করা কিছু লোককে ধরা হলো। চোর ধরা হলো কিন্তু ডাকাত রেহাই পেল। দুর্নীতি দমনের নামে সকল সেক্টরে শুধু আতংকই সৃষ্টি করা হলো। পরিণতি হলো অর্থনৈতিক স্থবিরতা, অর্থনৈতিক সংকট। দুদক চেয়ারম্যান একজন বিচারকের আসনে। তিনি হবেন ঠাণ্ডামাথার লোক, নিরপেক্ষ, ভারসাম্যপূর্ণ। তার কথাবার্তা শুনলে কিন্তু তা মনে হয় না। এছাড়া বহু বিষয় আছে যা জরুরি বিধিমালার কারণে এখন লেখা যাচ্ছে না। কথায় বলে যার কোনো ভিত্তি নেই তার বহু ভিত্তি। এই সরকারের নিজস্ব কোনো চরিত্র নেই ক্ষমতাও নেই। তাদের ক্ষমতার উৎস বহু। পশ্চিমা বন্ধুদের পরামর্শ এই সরকারের প্রধান শক্তি। যদিও পশ্চিমা বন্ধুদের পরামর্শ কোনোভাবেই আমাদের জনগণের কল্যাণে আসে না। পশ্চিমা বন্ধুদের পোষ্যপুত্র তাদের খুদকুঁড়া খাওয়া সুশীল সমাজ (যাদের কাজ হলো বিদেশীদের তাবেদারি করা) এই সরকারের অন্যতম পার্টনার। সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী আমলাতন্ত্র সরকারের প্রধান পার্টনার। মোটকথা এই সরকারকে বলা যায় ভিত্তিহীন, জবাবদিহিতাহীন, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, বহুমুখী তাঁবেদার সরকার।

শিশুদের দায়-দায়িত্ব নেই, বিবেকও নেই। শিশুদের মতো এই সরকার যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। ফলে দেশের বাজছে বারোটা। জনগণের উঠেছে নাভিশ্বাস। এই সরকারকে মূল্যবৃদ্ধির সরকার নামেও আখ্যায়িত করা যায়। বিশ্বব্যাংক থেকে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব করলে কোনদিক বিবেচনা না করেই সরকার মূল্য বৃদ্ধি করে ফেলে। এক্ষেত্রে আমলারা হলো সহায়ক শক্তি। আমলাদের একাংশ বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখে। এরা অবসরের পর বিশ্বব্যাংকে একটি চাকরির অপেক্ষায় থাকে। ফলে বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাব এলে সঙ্গে সঙ্গে তারা সায় দেয়। চাল, গম, তেলের দাম দ্বিগুন হওয়ার কারণ আমলাদের অসহযোগিতা ও উপদেষ্টাদের নির্বুদ্ধিতা। বলা হয় আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধি। আমাদের দেশে চালের দামের সঙ্গে কোনো সময়ই আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে মিল ছিল না। চাল উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। উৎপাদন খরচ ভিত্তিক দাম নির্ধারিত হয়ে থাকে স্বয়ংক্রীয়ভাবে। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে যে চালটা কেনা হয়ে থাকে তা সাধারণত ওএমএস পদ্ধতিতে হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি হয়ে থাকে। ফলে এই দাম বাজারে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। চালের বাজারে সব সময়ই একটা সহনীয় দাম বজায় ছিল। খাদ্যের দাম কম থাকার কারণেই আমাদের দেশে শ্রমের বাজার সস্তা। যে কারণে বিদেশী আমদানিকারকরা আমাদের দেশের পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী। গার্মেন্টস সেক্টরে সস্তা শ্রমের কারণেই আমাদের এই অভাবনীয় উন্নতি। গম-চালের দাম দ্বিগুণ হওয়ার ফলে শ্রমের বাজারে সৃষ্টি হবে অস্থিরতা। ব্যবসার বাজারে বইবে গরম হাওয়া। আর এই জন্যে বিশ্বব্যাংকের প্রতি আজ্ঞাবহতা ও উপদেষ্টাদের নির্বুদ্ধিতাই দায়ী। বাংলাদেশের জনগণের কাছে এই সরকারের কোনো জবাবদিহিতা নেই। জবাবদিহি করতে হয় সরকারকে দাতাদের কাছে। দাতারা কথায় কথায় হস্তক্ষেপ করে পরামর্শ দেয় যা মানতে সরকার বাধ্য হয়। ফলে চরিত্রগতভাবে এই সরকারকে তুলনা করা যায় ইরাকের মালিকী, আফগানিস্তানের কারজাই সরকারের সঙ্গে। দেশের জনমত ও স্থানীয় চাহিদা এবং দাতাদের হস্তক্ষেপ পরস্পর বিরোধী। উভয় দিক রক্ষা করতে গিয়ে সরকার শ্যাম-কূল কোনোটাই রক্ষা করতে পারছে না। [লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট, সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাবেক পরিচালক ও ৬০-এর দশকের ছাত্রনেতা।]